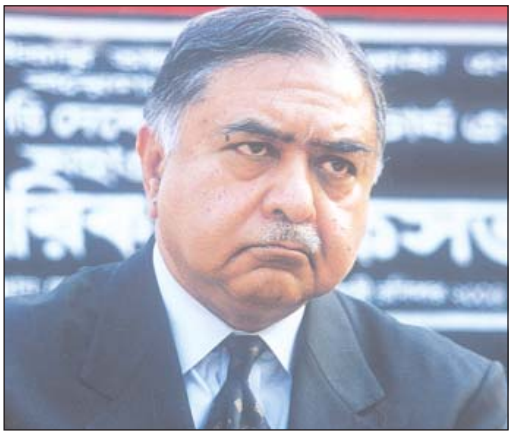

সুস্থ রাজনীতির অর্জন বাংলাদেশ

ড. কামাল হোসেন

ঔপনিবেশিক আমলে মানুষ বঞ্চিত থাকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সময় আমরা প্রজা ছিলাম। ১৯৪৭ সালে ভেবেছিলাম আমরা নাগরিক হয়েছি। ভাগ্য পরিবর্তনের ক্ষমতা পেয়েছি। ১৯৪৭-এর পরেও দেখা গেল তা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। ১৯৫৪তে একটা আশার আলো দেখে মানুষ শক্তি সঞ্চয় করলো, ঐক্যবদ্ধ হলো। কিন্তু ঐক্য ধরে রাখা গেল না। শাসক-শোষক গোষ্ঠী পুরোপুরি সুযোগ নিল বিভেদ সৃষ্টি করার। সর্বোপরি সামরিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তারা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করলো। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনগণ সামরিক শাসন মেনে নিতে চাইলো না। ষাটের দশকে আমরা দেখলাম অস্ত্র ও অর্থের ওপর নির্ভর করে, ধর্মের দোহাই দিয়ে তারা মনে করেছিল রাষ্ট্রীয় কাঠামো ধরে রাখবে। যার মাধ্যমে তারা শাসক শোষকদের স্বার্থ রক্ষা করে যাবে। তারা ধরেই নিয়েছিল যে ধর্মের দোহাই দিয়ে এখানে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে বেড়ে উঠতে দেবে না। প্রথমে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে এটা কাজে লাগানো হয়েছিল। তারপর আমাদের যখন স্বায়ত্তশাসনের দাবি উঠলো, আমাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসাবে পরিচিত করতে চাইলো। এটা হলে ইসলাম বিপন্ন হবে।

আমি তখন একজন তরুণ আইনজীবী। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকও। আমাদেরকে এই বলে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হয়েছে যে এখানে তোমরা যদি বাঙালি হিসাবে অধিকার দাবি কর, সংহতির ওপর একটা আঘাত পড়বে এবং এখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী যারা আছে তারা শক্তি সঞ্চয় করবে। কিন্তু ষাটের দশকের রাজনীতির বৈশিষ্ট্যই ছিল মানুষের মধ্যে একটা গণজাগরণ সৃষ্টি করা। সত্যিকার অর্থেই সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিলো। '৭০-এর ঘূর্ণিঝড়ের সময় পটুয়াখালীতে গেছি, যে আমতলি একদম প্রত্যন্ত অঞ্চল, সেখানে একটা বাচ্চা ছেলে নাচছে আর বলছে, বৈষম্য পশ্চিম পাকিস্তানে, এ জিনিসের দাম এতো কেন এখানে? সেগুলো মুখস্থ করেছে সে। তখন আমি বুঝতে পেরেছি মানুষের মধ্যে কতোখানি জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে যে ১২ বছরের একটা ছেলের এগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে। এটা ছিল সুস্থ রাজনীতির অর্জন। ৬ দফার ডাক দিয়ে জাতীয় নেতৃবৃন্দ জেলে চলে গেলেন। আইনজীবী হিসাবে তাদের পাশে দাঁড়াতে হয়েছে। কোর্টে যেতে হয়েছে। ইত্তেফাক পত্রিকা যখন বাজেয়াপ্ত হয়েছে '৬৬ সালে আমাদের তার পক্ষে দাঁড়াতে হয়েছে। বিনাবিচারে যাদেরকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হতো তাদের কেসগুলো আমি করেছি। এই কেসে নেতৃবৃন্দের পক্ষে দাঁড়াতে গিয়েই আমি রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। এভাবে আরো অনেক রাজনীতিবিদ, শিক্ষক রাজনীতিতে চলে এলেন। মোটামুটিভাবে '৫৯ সাল থেকে সম্পৃক্ত হওয়া শুরু হলো। ৬ দফার ডাক দেয়ার পর পশ্চিম পাকিস্তানিরা অস্ত্রের ভাষায় কথা বলার হুমকি দিল এবং আক্রমণ শুরু করলো। গ্রেপ্তার করলো নির্বিচারে।

শেখ মুজিবুর রহমান তখন আমাদের কাছে পরিচিত মুজিব ভাই হিসেবে। দারুণ সাহসী, জনপ্রিয় নেতা তিনি। আমরা তখন তার ভক্ত। নেতৃত্বের বলিষ্ঠতার কারণে জনগণের মাঝে তার গ্রহণযোগ্যতা এবং শ্রদ্ধা বাড়ছে। আমরা দেখছিলাম বাঙালি জাতি যে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে, সেই কথাগুলো তিনি অত্যন্ত যুক্তি দিয়ে তুলে ধরছিলেন। বারবার মুজিব ভাইকে গ্রেপ্তার করে জেলে ঢোকানো হচ্ছে। তিনি বেরিয়ে এলে আবারো একই কথা বলছেন। ভয় বা লোভ দ্বারা তাড়িত হচ্ছেন না। অথচ '৫৪তে আমরা জয়ী হয়েও সেই বিজয়ের ফসল ভোগ করতে পারিনি, আমাদের মধ্যে বিভক্তি এলো এবং আপোসকামী একটা ভূমিকা অনেকে অবলম্বন করলেন। তারা গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন রকম সমঝোতা করলেন।

যুক্তফ্রন্টের জোটটা যদি একসঙ্গে থাকতে পারতো তাহলে তখন আমাদের যে অর্জন সেটাকে আমরা সুসংহত করতে পারতাম এবং বিশেষ করে একটা বিশ্বাস ছিল যে আবার যদি নির্বাচন হয় তবে সে নির্বাচনে বাঙালি জাতি সেই লোকদেরকে নির্বাচিত করবে যারা আপোসহীনভাবে অবস্থান নিয়েছিল। সে নির্বাচন করতে দেয়া হয়নি '৭০ পর্যন্ত। '৫৮তে মার্শাল ল' হলো। আমরা মেজরিটি হওয়া সত্ত্বেও যেন ক্ষমতায় না যেতে পারি তার জন্যে বিভিন্ন কলাকৌশল, ধর্মের দোহাই দিয়ে একটা সাম্প্রদায়িক রাজনীতিও শুরু করা হলো। যে মুসলিম লীগ '৫৪তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তাদেরকে সামরিক আইনের ছত্রছায়ায় আবার পুনর্জীবিত করা হলো। সবুর খান, ওয়াহেদুজ্জামান, ফজলুল কাদের চৌধুরী এরা কিন্তু '৫৪-এর নির্বাচনে সবাই পরাজিত হয়েছিল এবং ধরে নেয়া হয়েছিল যে রাজনীতিতে এদের কোনো ভূমিকা থাকবে না। কিন্তু পশ্চিমাদের সামরিক শাসন এদেরকে পুনর্জীবিত করলো।

তখনকার সুস্থ রাজনীতি জনগণের শক্তিকে পরিবর্তনের পক্ষে টেনে বের করে এনেছিল '৬০-এর দশকে। আমার স্পষ্ট মনে আছে, কিভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্য থেকে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ শুরু হলো। এখানেই কিন্তু ভয় ভাঙল এবং কিছু নেতৃত্বকে তারা চিহ্নিত করলো যারা সাহসিকতার সঙ্গে সামরিক বাহিনীর সামনে দাঁড়ানোর মতো একটা অবস্থান নিচ্ছিল। সেখানে মুজিব ভাই মানে শেখ মুজিব

বিশেষভাবে বেরিয়ে আসলেন, সাহসী ভূমিকা রাখলেন। বাম রাজনীতির নেতৃবৃন্দের ওপর মার্শাল ল'র স্টিমরোলার এমনিই চলছিল, ন্যাপের ওপর আক্রমণ হচ্ছিল। শেখ মুজিবকে তারা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করলো। তাছাড়া বাম এবং মূলধারার জাতীয়তাবাদী রাজনীতি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের মধ্যে একটা বিভেদ জিইয়ে রাখতে চেয়েছিল। কেননা '৫৪-এর পর আওয়ামী লীগ থেকে ন্যাপ বা বামরা সরে গিয়েছিল। ৬ দফা তথা জাতীয়তাবাদী রাজনীতির যে মূলধারা ছিল, তার মধ্যে গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা, '৫০ দশকে এসে গেছে। যদিও ২১ দফার মধ্যে সমাজ পরিবর্তনের কথা ছিল, অর্থনীতি পরিবর্তনের কথা ছিল।

কিন্তু '৬০-এর দশকে এই জিনিসটাকে আবার সামনে এনে বামরা বাম রাজনীতিকে সক্রিয় করেছিল। একটা ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সূচনা হলো যখন ১১ দফাকে কেন্দ্র করে একটা ঐক্য করা সম্ভব হলো '৬৯-এ। আমার মতে এটা একটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কেননা ১১ দফার মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী যে কথাগুলো ছিল যেমন সমাজ পরিবর্তন, শোষিত মানুষের আকাঙ্ক্ষা, কৃষক, শ্রমিকের দাবি সব চলে আসলো। মূলত ৬ দফা এবং ১১ দফার মধ্যে যে সমন্বয় করা হলো এবং ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন যখন একত্রিত হলো, এর মধ্যে দিয়ে একটা বৃহত্তর ঐক্যের কাঠামো গড়ে উঠলো। এই রাজনীতির দ্বারাই '৬৯-এ আইয়ুব খানকে বিদায় দেয়া সম্ভব হলো। শেখ মুজিব বেরিয়ে আসলেন, আগরতলা মামলাকে প্রত্যাহার করতে হলো, সসম্মানে সবাই বেরিয়ে আসলেন এবং সাহসী নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসাবে ছাত্র সমাজ তাঁকে বঙ্গবন্ধু হিসেবে বরণ করলো।

সেই সময় আমি বঙ্গবন্ধুর খুব কাছে এসেছি। ওনার কৌসুলি হিসাবে। আগরতলা মামলায় তিনিই ডেকে পাঠালেন। বললেন, আমি চাই তুমি আমার ল' ইয়ার হও। যদিও আমি ক্রিমিনাল প্র্যাকটিস সে রকম করতাম না, সালাম খান ওনার কৌসুলি ছিলেন। তিনি আমাকে ডেকে বললেন যে দেখ আমার ওপর ওরা প্রেসার দেয় যে আমি জেলে গিয়ে ওদের সঙ্গে যেন কথাবার্তায় যাই। আমি চাই না যে আমার ওপর এভাবে প্রেসার দেয়া হোক, তুমি এখানে আমার কৌসুলি হয়ে যাও। আমি ওনার আরো কাছে আসার সুযোগ পেলাম '৬৯-এর প্রথম দিকে যখন আগরতলা মামলার প্রথম ধাপে তাজউদ্দিন সাহেবদেরকে ছাড়লো। তখন মুজিব ভাই আমাকে বললেন, তুমি তাজউদ্দিনের সঙ্গে থেকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য কর। আমি তখনও পুরাপুরি পার্টিতে জয়েন করিনি। কিন্তু ওনার কৌসুলি হিসাবে এতো ঘনিষ্ঠ হয়েছি যে তিনি আমাকে একজন বিশ্বস্ত কর্মীর মতো তাজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে কাজ করতে বললেন। এভাবেই আমরা কাজ করতে আরম্ভ করলাম। রাউন্ড টেবিল

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কার প্রসঙ্গে কিছু বলা প্রয়োজন। সরকার বলা শুরু করেছে যে তারা নির্বাচনে জিতবে বলে সংস্কার চাওয়া হচ্ছে। এটা তো জেতা-হারার ব্যাপার নয়। ফাউল রেফারিকে দিয়ে তো কোনো সৎ খেলোয়াড় খেলতে চাইবে না। যত ভালোই খেলোয়াড় হোক না কেন, রেফারি যদি ফাউল করে, নিরপেক্ষ না হয়, কোনো প্রকৃত খেলোয়াড় সেখানে খেলবে না

কনফারেন্সের যখন কথা হয়েছে তখন বঙ্গবন্ধুর অংশ গ্রহণের কথা উঠেছে, তিনি বলেছেন আমি বিচারাধীন লোক হিসাবে যেতে পারি না, আমি একজন জাতীয় নেতা হিসাবে অংশগ্রহণ করতে পারি যখন কেসটেসগুলো থাকবে না। এ বিষয়গুলো নিয়ে আমরা বিভিন্ন জায়গায় তাজউদ্দিন ভাইয়ের সঙ্গে এমন কি ইসলামাবাদও গেছি। আমরা বলেছি যে মুজিবভাই আসবেন তবে শর্ত হলো যে সসম্মানে একজন জাতীয় নেতা হিসেবে অংশগ্রহণ করতে চান। বিচারাধীন ব্যক্তি হিসাবে তার পক্ষে আসা সম্ভব নয়। ১৯-২০ ফেব্রুয়ারির দিকে নাটক হলো। ইসলামাবাদ থেকে আমাকে ফোনে ওরা জানায় যে বঙ্গবন্ধুকে আমরা জামিন দিয়ে দিচ্ছি। আরো বললো, এই মুহূর্তে ছেড়ে দিচ্ছি আর প্লেন পাঠাচ্ছি ওনাকে যেন নিয়ে আসা হয়। পুরো শহরে গুজব ওনাকে এখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যে দিন এটা ঘটলো তার আগের দিন বা দু'দিন আগে সার্জেন্ট জহুরুল গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে ওনার কাছের সেলে।

ওনাকেও ভয় দেখানো হচ্ছে যে, এই অবস্থায় যে কোনো কিছু হতে পারে। তখনই আমি দেখেছি যে ওনার সাহস কতোটুকু, চরিত্র কতোটা আপোসহীন। উনি পাইপ হাতে রেখে বলছেন, দেখ, আমার বিশ্বাস নির্দিষ্ট সময়ের ১ সেকেন্ড আগেও আমার মৃত্যু ঘটবে না, ১ সেকেন্ড পরেও না। অর্থাৎ যদি জহরুল হকের মতো আমার মৃত্যু যেখানে ঘটার ঘটে, তোমরা কিছুই করতে পারবে না। আমাদেরকে আরো বললেন, বলে দাও ওদেরকে যে আমি মৃত্যুর ভয় করি না। আমার যদি মৃত্যু ওখানে বন্দি হিসাবে লেখা থাকে হবে। আর যদি না হয় তো আমি এখান থেকে মাথা উঁচু করে বেরিয়ে যাব, আমি এভাবে একটা আপোস করে যাবো না। এদিকে ইসলামাবাদ থেকে ওরা বলছে জামিনের দরকার নেই। জেল গেট খুলে দেয়া হবে। উনি যেন একদম মাথা উঁচু করে হেঁটে বেরিয়ে আসেন। আমি এটা বলাতে উনি হাসলেন। বললেন, আমি এতো কাঁচা নাকি। আমি হাঁটা শুরু করবো আর ওরা পেছন থেকে গুলি চালাবে যে ও জেল থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলো। ইতিমধ্যে জেনারেল মুজাফফর এসে জানালেন, লাখ লাখ মানুষ মশাল হাতে ক্যান্টনমেন্টের দিকে যাচ্ছে। ওরা যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে সে ক্ষেত্রে একটা রক্তারক্তি বেধে যাবে। তিনি কথা দিলেন পরদিন ১২টার মধ্যে শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়া হবে।

১৯ অথবা ২০ তারিখ শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেয়া হলো। সেখানে আমি ছিলাম। ব্যারিস্টার আমিনুল ইসলামও ছিলেন।

পরের দিন ১১টা পৌনে ১২টায় খবর পেলাম যে শেখ মুজিবকে ওরা ৩২ নম্বরে নিয়ে গেছে, আমি তখন ছুটে গেলাম। দেখি লাখ লাখ মানুষের ভিড় ৩২ নম্বরে। ভিড় ঠেলে ঢোকার পর শেখ মুজিব বললেন, জেনারেল মুজাফফর উদ্দীন নিজে জিপে করে নিয়ে এসেছে মানুষকে এড়ানোর জন্য। রাস্তা এড়িয়ে রানওয়ের ওপর দিয়ে শেরে বাংলা নগর দিয়ে ওনাকে ৩২ নম্বরে এনে নামিয়েছে। আমি এসব ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছি সুস্থ রাজনীতির কি শক্তি তা তুলে ধরার জন্যে। যার কাছে সামরিক শক্তি পর্যন্ত মাথা নিচু করেছে।

আরো যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো নেতৃত্বের ওপর যেমন মানুষের আস্থা থাকে তেমনি মানুষের ওপর নেতার আস্থা থাকতে হয়। নেতা টাকা, পেশিশক্তি এগুলোকে নয়, মানুষের মধ্যে যে একটা অন্তর্নিহিত শক্তি আছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য সেটাকে জাগ্রত করেন। আপনি যদি '৫০-এর দশক '৬০-এর দশকের রাজনীতি দেখেন, যেমন রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন। বাংলার রাষ্ট্রভাষা হবার ব্যাপারে যে বাধার সৃষ্টি করছিল তাকে অন্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা হলো। মানুষের হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না, কিন্তু মানুষকে এটা অন্যায় হিসাবে বোঝানো গেল। নেতৃত্বের কাজটা ছিল সবাইকে এটা বোঝান যে এটা একটা অন্যায় এবং মানুষ সেটা বুঝতে পারলে তাদের মধ্যে সেটার প্রতিবাদ প্রতিরোধ করার শক্তি সৃষ্টি হয়ে যায়।

এভাবে মানুষের ওপর আসা, মানুষের মধ্যের শক্তি টেনে বার করা এবং জনগণের সংগঠন গড়ে তোলা হলে নেতৃত্বের দক্ষতায় প্রকাশ। এখানে আমি ৭ মার্চের কথা বলবো। যেখানে সংগঠনের মাধ্যমে জনতাকে জাগ্রত করা সম্ভব হয়েছিল। এবং সব মিলিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল সুস্থ রাজনীতি যেটা লক্ষ্য অর্জন করতে পারে এবং করেও ছিল। তবে স্বাধীনতা অর্জনের পর এ ঐক্য আমরা ধরে রাখতে পারিনি।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে ঐক্য ছিল। আওয়ামী লীগ, অন্যান্য পার্টি, মুজিবনগর সরকার একত্রে

কাজ চালিয়েছে। ফিরে এসে ছাত্রলীগের বিভাজন হলো। সিরাজুল আলম খান ওরা দুই ভাগে ভাগ হলো। জাসদ হলো। তারপর ন্যাপ বামদল যারা যারা ছিলেন তাদের আর আওয়ামী লীগের মধ্যে দূরত্বের সৃষ্টি হলো।

আমার যেটা ধারণা এটা নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা যেটা ১৯৫৪ সালেও লক্ষ্য করা গেছে।

এই যে বিভক্তি হলো এবং স্বাধীনতার পর স্বাধীনতাকে সুসংহত করার জন্য যে ধরনের রাজনীতি প্রয়োজন ছিল সেটা না করার কারণেই কিন্তু ১৯৭৫ সালের নৃশংস ঘটনা ঘটে গেল। বঙ্গবন্ধু চেষ্টার ত্রুটি করেননি। কিন্তু যা করতে চেয়েছিলেন তা করতে পারেননি বলেই তো তাঁর নিজের জীবন হারাতে হলো।

নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার প্রতিযোগিতা ফাটলের জন্ম দিল। নতুন স্বাধীন বাংলাদেশের শাসন কাঠামোর যে দুটো দিক, রাষ্ট্রীয় সরকারি কাঠামো এবং দলগত নির্দিষ্ট কাঠামো। এই উভয় ক্ষেত্রেই দলের সবাই তখন ব্যস্ত যে কে কোন জায়গাটা ধরবেন। স্বাভাবিকভাবেই তাজউদ্দিন আহমেদ তখন সবার টার্গেট হয়ে গেলেন। তিনি সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। আবার নয় মাস অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। যারা যেখানে নিজেদেরকে চিন্তা করে রেখেছিল তারা বঙ্গবন্ধু আর তাজউদ্দিনের মধ্যে একটা দূরত্ব সৃষ্টি করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল।

খন্দকার মোশতাক এদের একজন। একদিন আমি ৩২ নম্বরে গেলে তিনি বললেন, কামাল সাহেব আপনি জানেন তাজউদ্দিন সাহেব চাননি যে আপনি আর মুজিব ভাই ফিরে আসেন। আমি বললাম, মুশতাক ভাই, আপনাদের সিনিয়রদের কথা আমাকে বলবেন না। আমি কাজ সেরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। বছরখানেক পর আমি উপলব্ধি করলাম যে তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে তারা ঘরের ভেতরে গিয়ে ক্যাম্পেইন করেছেন। কারণ সে দিন বঙ্গবন্ধুর স্ত্রীও সেখান থেকে কথাগুলো শুনছিলেন।

আমি বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়েছি বঙ্গবন্ধু এবং তাজউদ্দিন সাহেবের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টির প্রক্রিয়ায়। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গেও এ ব্যাপারে কথা বলেছি। ১৯৬৯ সালের আগে আমি তাজউদ্দিন সাহেবকে চিনতাম না। বঙ্গবন্ধুকে আমি ১৯৫৯ সাল থেকে চিনতাম-জানতাম। তাঁর মাধ্যমেই তাজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আমি পরিচিত হই। বঙ্গবন্ধু তাঁর সঙ্গে কাজ করতে বললেন আমাকে। তখন তাঁদের মধ্যে এতো সুন্দর একটা সম্পর্ক ছিল। প্রথমে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে তাজউদ্দিন প্রধানমন্ত্রী হোক। বঙ্গবন্ধু পার্টি চালাবেন। রাজনৈতিক দিকটা, সাংগঠনিক দিকটা, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার বিষয়গুলো বঙ্গবন্ধু দেখবেন। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা তাজউদ্দিন সাহেবকে দেখতে বললেন। এটা অনেকেই পছন্দ করেনি। বঙ্গবন্ধুর কান ভারী করার কাজটা তখন থেকেই শুরু হয়ে গেল। এমন কথা প্রচার হলো যে তাজউদ্দিন সাহেব বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে নিজের একটা অবস্থান গড়ে নিতে চেয়েছিলেন। এটা সর্বৈব মিথ্যা- নিজের জীবন দিয়ে দু'জনই সেটা প্রমাণ করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর একটা কথা আমার এখনো কানে বাজে। তিনি বলেছিলেন, আমি আদমের সন্তান। ফেরেশতা বা ইবলিশ কোনোটাই না। আমারও ভুল হতে পারে। সেটা সংশোধনের জন্য তোমরা মুখ খুলে কথা বল।

আমাকে আবার মন্ত্রিসভায় আনলেন। বাকশাল যখন হলো, আমি তাঁর কাছ থেকে অব্যাহতি নিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলাম একটা ভিজিটিং ফেলোশিপ নিয়ে। এর আগে এক বৈঠকে প্রায় চার ঘন্টা আমরা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ করেছি। যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছি, বাকশাল ক্ষতি করবে। বঙ্গবন্ধুর যুক্তি ছিল বৃহত্তর ঐক্যের জন্য অন্যান্য দলকে কাছে টানতে হবে। বিশেষ করে যে প্রগতিশীল দলগুলো আছে তাদের নিয়ে জাতীয় ঐক্যের সরকার গঠন করার জন্য এটা করতে হবে। যারা আওয়ামী লীগ করেন না তাদেরও। যেমন আবু সায়ীদ চৌধুরী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী, ড. মল্লিকা- যারা সমাজে আরো ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত তাদের তিনি পরে আনলেন। তিনি সবাইকে এক করে একটা ঐক্য গড়তে চেয়েছিলেন। আমি বললাম এখানে আপনার ক্ষমতার কোনো ঘাটতি নাই। কেউ আপনার সামনে বিদ্রোহ করবে। সুতরাং কেন আপনি প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতিতে যাবেন। এটা করা মানে আপনি সবকিছুর জন্য টার্গেট হয়ে যাবেন? 'ক্যু'-এর কথা তখন মাথায় আসে নাই। কিন্তু যে কোনো কিছু খারাপ হলে, সেটা আপনার ঘাড়ে আসবে। আর সেটাই কিন্তু শুরু হলো। সবাই বলছে, ভাই আমি কি জানি, ওনাকে জিজ্ঞেস করেন। এই যে প্রবণতা শুরু হলো ১৯৭৪ সালের পর থেকে। মাঝে তিনমাস জানুয়ারি থেকে মার্চ দেশে ছিলাম না। মার্চ মাসে তিনি আমাকে চিঠি পাঠালেন, দেশে চলে আসার জন্য সামনাসামনি কথা বলা দরকার। সম্ভবত ১৬ মার্চ আমি ফিরি। বঙ্গবন্ধু বললেন, দেশের যা অবস্থা তাতে এখানে তোমার প্রয়োজন আছে। তিনি বললেন, রাতের অন্ধকারে আমার কিছু কলিগ তার জেলার ক্যাপ্টেন, মেজরদের সঙ্গে মিটিং করছেন। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, মন্ত্রিপরিষদে থাকার মতো এতো সিনিয়র মানুষরা থাকতে আমাকে কেন তিনি চাইছেন? উত্তরে বলেছিলেন, 'তোমার একটা জিনিস পছন্দ করি। সেটা হচ্ছে অপ্রিয় সত্য কথা বলতে তুমি দ্বিধাবোধ করো না। আমার কেবিনেটের কয়জন এটা পারে'? আমি মনে করি আজকের রাজনীতির যে অবক্ষয় এ জিনিস থেকেই শুরু। অপ্রিয় সত্য কথা বলায় দ্বিধাবোধ করা। যারা রাজনীতিতে আছি, পার্লামেন্টে আছি, আমার যারা বন্ধু, উভয় দলেই আমার বন্ধুরা আছেন। তাদেরকে আমি বলি, আপনারা সংসদে উচিত কথা বলেন না কেন? সংসদই তো সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা সঠিক কথা বলার। লক্ষ্য করবেন, ১৯৯০ সাল পর্যন্ত তো আমরা সংসদকে পাইনি। তখন প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি ছিল। এটাকে বলতাম রাবার স্ট্যাম্প সংসদ। প্রেসিডেন্টকে খুশি করায় সবাই ব্যস্ত।

রাজনীতি মানুষকে সচেতন করে, মানুষকে কেন্দ্র করে মানুষের অবস্থার পরিবর্তন আনার জন্য মানুষের শক্তিকে বৃদ্ধি করে সংগঠিত করে মানুষকে। সেই শক্তি দিয়ে মানুষ একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজ পরিবর্তন, দেশের সার্বিক উন্নতি অর্জন করতে পারবে। এটা হলো আমার রাজনীতি, যে রাজনীতি আমরা দেখেছি। যে রাজনীতির মধ্য দিয়ে ষাট দশকে মানুষ সচেতন হয়েছে। সামরিক শক্তি থেকে মানুষ মুক্ত হয়েছে এবং নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করা, নিজের সমাজের মৌলিক পরিবর্তন করার সেই রাজনীতিকে আমরা কিভাবে রোগাক্রান্ত হতে দিয়েছি। প্রথমত আমরা দেখলাম '৭৫-এর পরে, কেউ সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে বুঝেছে দল গঠন করা লাগবে। যারা সামরিক শক্তিকে ক্ষমতায় এনেছেন। ওরা সবাই বলছে যে একটা দল গঠন করবেন। এজন্য যত কোটি টাকা লাগবে তারা দিতে রাজি আছেন। এভাবেই দল গঠন হলো। এটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না, অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য ছিল। এভাবে রাজনীতিতে ঢুকলো টাকা-পয়সা দিয়ে কর্মী ভাড়া করা, বেতনভোগী কর্মী। আমরা '৭৫-এর আগে যে রাজনীতি করেছি সেখানে

এখানে তো আর কেউ বোমা মারতে আসবে না। একটা সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে যে কে বা কারা এই সন্ত্রাস করছে। এ দল, ও দল কে করছে আমি জানি না। কিন্তু চিহ্নিত করা সম্ভব। এটা কিন্তু বাংলাদেশের একটা বৈশিষ্ট্য এখানে খুব গোপনে তেমন কিছু হয় না। রাষ্ট্রের এটা ব্যর্থতা যে তারা জেনেও ভাব করে যে তারা জানে না। সবাই জানে। রাষ্ট্র তো একশ' ভাগ জানে কারা সন্ত্রাস করছে, কারা গডফাদার আমরাও জানি

কর্মী কখনো বেতনভোগী ছিল না। কর্মী স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে আসবে। কিছু কিছু হোল টাইমারকে আমাদের পকেট থেকে পয়সা দিয়ে চালাতে হয়েছে অথবা বিভিন্ন জন বিভিন্ন দায়িত্ব ভাগ করে নিয়ে পরস্পরকে সাহায্য করেছে। কিন্তু বেতনভোগী। ওটা প্রশ্নই ওঠে না। অথবা ওদেরকে একদম ফ্রি করে দেয়া যে চাঁদাবাজি করে টাকা তুলে রাজনীতি করবে এটা অকল্পনীয় ছিল।

এভাবে পেছনের দিকে সমাজকে হটিয়ে দেয়া হয়েছে। রোগ এতো গুরুতর যে রাজনীতি পরিণত হয়েছে ক্ষমতার প্রতিযোগিতায়। চর দখলের মতো সংসদ দখল করা, সংসদে আসন দখল করা। বিভিন্ন জায়গায় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজের দখলে নিয়ে আসা। এটা কিন্তু গণতান্ত্রিক রাজনীতির ষোলআনা পরিপন্থি।

জনগণের প্রতিনিধিরা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য সৎভাবে পরিশ্রম করছে- যদি এই অবস্থাটা আমরা কখনো আনতে পারি, তাহলে গণতন্ত্র মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারবে। এটা হচ্ছে না। কারণ টাকা। এই টাকার পরিমাণ বাড়তে বাড়তে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। ১৯৭৩-এ যখন নির্বাচন হয় ২-৩ লাখ টাকা ছিল ব্যয় করার সর্বোচ্চ সীমা। আমি তো পঁচিশ হাজার টাকার বেশি খরচ করতে পারিনি। অবিশ্বাস্য হলেও কথাটা সত্য। নব্বইতে ৩ লাখের মধ্যে করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু ৫-১০ লাখ অনেক ক্ষেত্রেই ছাড়িয়ে গেছে। এ কথা কারো অস্বীকার করার উপায় নেই যে ২০০১ সালের নির্বাচনে কোনো কোনো জায়গায় ২৯ কোটি টাকা নির্বাচনী খরচের কথা আমরা শুনেছি। এক কোটি থেকে ২৯ কোটির মধ্যে ব্যয় হয়। এই প্রবণতা বন্ধ করা না গেলে গণতন্ত্র থাকবে না।

আমাদের ৫০ বছরের রাজনীতির ঐতিহ্য আছে। বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি, তাজউদ্দিনের রাজনীতিকে আমরা কেন আবার জাগাতে পারবো না? এটা তো আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য। আমাদের যারা পূর্ব পুরুষ, তারা নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে নীতির প্রশ্নে আপোস করা যায় না। তাঁরা তো ক্ষমতায় থাকতে পারতেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তো তারা তাজউদ্দিন সাহেবকে প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব দিয়ে এসেছিল। তিনি তো সে প্রস্তাব গ্রহণ করেননি।

ষাটের দশকে মার্শাল ল'য়ের মধ্যে খুবই ঝুঁকি নিয়ে আমাদের রাজনীতি করতে হয়েছে। তখন বোমা মারে নাই। কিন্তু অধিকাংশ লোককে জেলে নিয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধু, তাজউদ্দিন তারা জেলে ছিলেন। তখন ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা ঘরে ঘরে গিয়ে প্রচারণা চালিয়েছে। যদি সেইভাবে এখন আমরা ঘরে ঘরে, গ্রামে গ্রামে যেতে পারি। জনগণ যদি ক্ষমতার মালিক হয়ে থাকে, তাহলে আপনিও মালিক। তাহলে মালিক হিসেবে আপনি কিছু কাজ করেন না! এই যে ঘর-বাড়ি- দেশ ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে, এখানে তো আপনিও কিছু করতে পারেন। আপনি পাঁচজন প্রতিবেশি নিয়ে বসে ঠিক করুন কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে কিনা। এখানে তো আর কেউ বোমা মারতে আসবে না। সেখানে তো একটা সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে যে কে বা কারা এই সন্ত্রাস করছে। এ দল, ও দল কে করছে আমি জানি না। কিন্তু চিহ্নিত করা সম্ভব। এটা কিন্তু বাংলাদেশের একটা বৈশিষ্ট্য এখানে খুব গোপনে তেমন কিছু হয় না। রাষ্ট্রের এটা ব্যর্থতা যে তারা জেনেও ভাব করে যে তারা জানে না। সবাই জানে। রাষ্ট্র তো একশ' ভাগ জানে কারা সন্ত্রাস করছে, কারা গডফাদার আমরাও জানি। আমরা যদি কোনো এলাকায়, কোনো পাড়ায় গিয়ে বসি, তাহলে সবাই বলবে যে ওমুক, ওমুক সন্ত্রাসী। তারা তো চিহ্নিত।

এখানে জবাবদিহিতার প্রয়োজন আছে। আমরা যে ২১ আগস্টের ঘটনার তদন্ত করলাম সেখানে চিহ্নিত করেছি, এই যে অস্বাভাবিক ঘটনাগুলো ঘটছে বাংলাদেশে ইতিহাসে এগুলো কখনো ঘটে নাই। পল্টনে কম্যুনিস্ট পার্টির মিটিং-এ যেটা হলো সেটাই তখন নজিরবিহীন ঘটনা ছিল। ২১ আগস্টের ঘটনা তো আরো নজিরবিহীন। তারপর কিবরিয়া সাহেবের ঘটনা। এটা কেন ঘটছে! এর সঙ্গে কি অবৈধ অস্ত্রের কোনো সম্পর্ক আছে? এই প্রশ্ন এই জন্য করছি যে, সেখানে একই রকম অনেকগুলো গ্রেনেডের হামলা ছিল। একটা রিপোর্ট পাওয়া গেছে যে এটা আমাদের দেশ থেকে বর্ডার পার করা। এটা তাহলে কে বা কারা প্রশ্রয় দিচ্ছে। বাংলাদেশে কেউ না কেউ তো প্রশ্রয় দিচ্ছে। এগুলো তো পত্রিকায় এসেছে। বিদেশী রিপোর্ট থেকে তারা পুরোটা ছাপিয়ে দিয়েছে- এরা কিভাবে হংকং-এ কাদের টাকা দিয়েছে। আমাদের উপর দিয়ে বর্ডার পার করেছে। এটা তো আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার ওপর হুমকি।

আমি পরিষ্কার করেই কথা বলেছি এই ব্যাপারে। আমার ভূখন্ডের ওপর আমার নিয়ন্ত্রণ থাকবে। আমি কোনো দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলছি না। দেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে বলছি, আমার এই ৫৫,০০০ বর্গমাইলের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ আমার হাতে থাকতে হবে। ভূমির ওপর দিয়ে যে অবৈধ অস্ত্র আমদানি করে, পাচার করে আমার সার্বভৌমত্বকে তারা আঘাত করছে। আমি মনে করি আমাদের দেশের মধ্যে কোনো একটা সম্প্রদায়, যারা রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যেই অবস্থান করতে পারে। আমার সেই ক্ষমতা নাই ওদেরকে ধরার, যদি রাষ্ট্র না আমাকে সাহায্য করে। রাষ্ট্র এ ব্যাপারে কোনোভাবেই আমাকে সাহায্য করে নাই। উত্তর পর্যন্ত দেয় নাই। আমি চিঠির পর চিঠি দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত ভয়েজ অব আমেরিকায় তিন সপ্তাহ আগে আমার ইন্টারভিউ হলো মওদুদ আহমদের সঙ্গে। তিনি বললেন, তারা সবার সহযোগিতা চান। আমি বললাম, আমরা শুধু সহযোগিতা নয়, প্রস্তাব দিয়েছিলাম সাহায্য করতে চাই। শুধু আমাদের কিছু তথ্য দেন। অবৈধ অস্ত্রগুলো গিয়েছিল কোথায়, রাখা হয়েছে কোথায়, কে বা কারা নামানোর জন্য সাগরপথে বড় জাহাজে এগুলো এসেছে। সাগরপথে যে জাহাজ এসেছে তার পরিচয়, নাম, মালিকের তথ্য, এগুলো সরকারের অবশ্যই জানার কথা। আজকাল আন্তর্জাতিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। সরকার যদি আমাকে দায়িত্ব দেয়, আমি বের করে দেব। আমাকে এই তথ্যগুলো বিস্তারিত দিতে হবে। বাইরে পত্রিকায় দেখা যায়, এমনকি ইন্টারনেটেও দেখা যায়। আমরা যদি ইন্টারনেট থেকে বের করে নিতে পারি, তাহলে সরকারের তো এটা দায়িত্ব। রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। অথচ এই তদন্তের মধ্যে কী পাওয়া গেছে জানতে পারছি না। জাতীয় নিরাপত্তাকে আমরা হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছি। এটা সংসদেই ওঠা উচিত। আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তার যে তদন্ত হয়েছে সেটা তো আমরা ঢাকায় বসে দেখছি। ডিফেন্স মিনিস্টারকে তারা জেরা করছে যে তিনি পদত্যাগ করছেন না কেন। এটাই গণতন্ত্র। আমাদের সংবিধানে আছে যে পাবলিক এনকোয়ারি হতে পারে। চট্টগ্রামের পোর্টে যে অফিসারদের ধরা হয়েছিল তাদেরকে জেরা করতে চাই আমি। আমাকে সে সুযোগ দেয়া হয়নি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কার প্রসঙ্গে কিছু বলা প্রয়োজন। সরকার বলা শুরু করেছে যে

সেই সময় আমি বঙ্গবন্ধুর খুব কাছে এসেছি। ওনার কৌসুলি হিসাবে। আগরতলা মামলায় তিনিই ডেকে পাঠালেন। বললেন, আমি চাই তুমি আমার ল' ইয়ার হও। যদিও আমি ক্রিমিনাল প্র্যাকটিস সে রকম করতাম না, সালাম খান ওনার কৌসুলি ছিলেন। তিনি আমাকে ডেকে বললেন যে দেখ আমার ওপর ওরা প্রেসার দেয় যে আমি জেলে গিয়ে ওদের সঙ্গে যেন কথাবার্তায় যাই

তারা নির্বাচনে জিতবে বলে সংস্কার চাওয়া হচ্ছে। এটা তো জেতা-হারার ব্যাপার নয়। ফাউল রেফারিকে দিয়ে তো কোনো সৎ খেলোয়াড় খেলতে চাইবে না। যত ভালোই খেলোয়াড় হোক না কেন, রেফারি যদি ফাউল করে, নিরপেক্ষ না হয়, কোনো প্রকৃত খেলোয়াড় সেখানে খেলবে না। দেশের যে নির্বাচন হবে তার আম্পায়ারিং করবে নির্বাচন কমিশন। সেখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা থাকে। যেহেতু নির্বাচন কমিশনকে যতটুকু ক্ষমতা দেওয়ার কথা ছিল, সেটা দেয়া হয়নি। সরকারের হস্তক্ষেপ করার সুযোগ রয়েছে। ১৯৯৬তে এটা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়। মাগুরা উপ-নির্বাচন আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা। আওয়ামী লীগের আমলে টাঙ্গাইলের সখীপুরে কাদের সিদ্দিকীর নির্বাচনের তিক্ত অভিজ্ঞতা, ঢাকা-১০ আসনের এবারের অভিজ্ঞতা। কোনো দলের এমন উক্তি করা ঠিক নয় যে, যেকোনো ধরনের আম্পায়ার হোক না কেন আমরা খেলবো। ফাউল করলে ফাউল করবো। তার মানে হচ্ছে আমরা এমন আম্পায়ারই চাই যে ফাউল করলেও যেন লাল-হলুদ কার্ড দেখাতে না পারে।

যদি সদিচ্ছা থাকে তাহলে এক ঘন্টারও ব্যাপার না। আমরা এটা করেছিলাম নব্বইতে। এই ব্যাপারে কিছু বক্তব্য রাখার তো অধিকার আছে আমাদের। আমি তখন আওয়ামী লীগে ছিলাম। ইশতিয়াক সাহেব, ১৫ দল, আমরা সবাই বসে এটা করেছি। যেদিন এরশাদ সাহেব পদত্যাগ করেন আমরা সবাই একটা পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম। সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির নাম যদি ঘোষণা না হয় তাহলে আর্মি টেকওভার ছাড়া বিকল্প কোনো ব্যবস্থা থাকবে না। শূন্যতা তো থাকতে পারে না রাষ্ট্রে। বিভিন্ন নাম যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ, বিএনপির কাছে প্রতিনিধি যাচ্ছে। কিছু কিছু নাম আসছে। কিন্তু সেগুলো গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না।

তখন সুপ্রিম কোর্টে বসে আমরা বলেছি, চিফ জাস্টিস যিনি, তিনি তো নিরপেক্ষ। সবার কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা আছে। তাকে সবাই শ্রদ্ধা করে। তাহলে শাহাবুদ্দীন সাহেবের নাম বলি না কেন। আমি ছুটে গেছি ৩২ নম্বরে। তখন সবাই খুবই চিন্তার মধ্যে আছে। এর মধ্যে আবার বিএনপি মহলে ইশতিয়াক সাহেব যোগাযোগ করতে বললেন। তখন দুই পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে ঠিক হলো প্রধান বিচারপতির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব নেবেন। আমরা আগেই শাহাবুদ্দীন সাহেবের কাছে লোক পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কারণ দলগুলো মেনে নিলেও উনি নিজে যদি না মানেন। তারা মোটামুটি তাঁকে রাজি করিয়ে রেখেছিল। আমি তারপর ৩২ নম্বর থেকে ফোন করলাম। তিনি বললেন, আবার প্রধান বিচারপতির পদে ফিরে আসবেন কিভাবে। আমরা বললাম, সংশোধনী করে দেয়া হবে। সবাই এ ব্যাপারে যখন তাকে আশ্বাস দিল, তারপর বাস্তবায়িত হলো। তারপর ১৯৯৬ সালে যখন একই রকম সংকট সৃষ্টি হলো, কেন তখন সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আনতে হলো, এটা কিন্তু জানতে হবে। তখন যারা সরকারে ছিল দুর্ভাগ্যবশত দেখা গেছে তারা হস্তক্ষেপ করে। নিরপেক্ষ আম্পায়ারিং করতে দেন না।

এগুলোই রাজনীতির ভেতরের রোগ। এটাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যাপার মনে করা যাবে না। আমরা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কথা, রাজনীতির কথা বলবো, কিন্তু আম্পায়ার নিরপেক্ষ হবে না সেটা তো ঠিক নয়। কায়দা করে, কৌশলে কাউকে রাখা তো নিয়ম নয়। আমরা ব্যক্তিস্বার্থ না দেখে পাঁচটি নাম নিয়ে বসতে পারি। যেভাবে সালিশে নিয়োগ করি। উভয়পক্ষের সঙ্গে মতবিনিময় করে একজনকে গ্রহণ করতে পারি। এ দেশে তো সেটার অভাব নাই। এমনকি সংবিধানে লেখা আছে যে, প্রধান বিচারপতি যদি যোগ্য না হন বা ওই দায়িত্ব পালন করতে না চান, পরবর্তী যিনি আছেন তিনি করতে পারেন। একজন যে হতেই হবে এমন কোনো কথা নাই। কোনো রকম আপত্তি থাকলে সেটা শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ করা হয়। সুতরাং যেসব রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন, সবাইকে বসে ঠিক করতে হবে। আগামী নির্বাচন কমিশনে যারা আছেন তাদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তাদের নিয়োগের বিষয়েও একই সংকট দাঁড়াবে। সংকট চিত্র আমরা সৃষ্টি করছি। ন্যূনতম নৈতিকতা বোধ যদি আমাদের থাকে, অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচনকে যদি নাটকীয় রূপ না দিয়ে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করি তাহলে এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক থাকতে পারে না।

১৯৯০ সালে গ্রহণযোগ্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন সুলতান হোসেন খান। বিএনপির মাজেদুল হক খান আসলেন আমার কাছে। আমরা শাহাবুদ্দীন সাহেবের কাছে গেলাম। স্পষ্ট বলেছি, সুলতান হোসেন খান গ্রহণযোগ্য নয়। মাজেদুল হক সাহেবও বলেছেন। তিনি পদত্যাগ করেছেন। তারপর জাস্টিস রউফকে নিয়োগ করা হয়েছে উভয় পক্ষের সমর্থনে। এগুলো তো আমরা করেছি। আমি নিজে এই কাজে অংশগ্রহণ করেছি। মাজেদুল হক সাহেব আমার সঙ্গে ছিলেন। আমরা তো বেঁচে আছি। নব্বইতে আমাদের উভয় পক্ষের মতামত শাহাবুদ্দীন সাহেব গ্রহণ করেছেন। অথচ এখন রোগটা গুরুতর হয়েছে।

এখন মানুষ অর্থবহ পরিবর্তন আশা করে। সেটা গণতান্ত্রিক, সংবিধানিক পদ্ধতিতে। আমাদের অভিজ্ঞতা আছে অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক পদ্ধতিতে কে বা কারা রাষ্ট্রের যন্ত্র দখল করে বলেছে আমরা দেশকে বাঁচানোর জন্য চলে এসেছি। আমরা মনে করি এই পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা কোনো সময়ই মঙ্গলজনক নয়। বিপজ্জনক। আমরা জানি এরপর কী হয়। কোনো কিছুই সীমার মধ্যে থাকে না। সংবিধানের অর্থই হচ্ছে সীমারেখার মধ্যে আমাকে ক্ষমতা দেয়া হয়। যা ইচ্ছা তাই করা যায় না। তাই সংবিধানের মাধ্যমেই পরিবর্তন আনতে হবে। ফ্রি স্টাইল আম্পায়ারিং নয় এটা। পয়সা দিলাম, আর খেলোয়াড়দের বললাম কোনো নিয়ম মানার দরকার নেই। যেভাবেই হোক মারতে থাকো। আম্পায়ার লাল-হলুদ কার্ডও দেখাবে না, সিটিও বাজাবে না। এটা তো খেলা হলো না। শেষ পর্যন্ত দর্শকরাই নেমে এসে ম্যাচ ভেঙে দেবে। এটাই দেশের ব্যাপার। ১০/২০টা নাম নিয়ে সবাই বসলে কেন পারবো না?

সন্ত্রাসমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা আমরা চাই। সাম্প্রদায়িকতা দেশের বিভাজন সৃষ্টি করুক সেটা আমরা চাই না। আর ধর্মীয় দোহাই দিয়ে রাজনীতিতে বৈষম্য আসুক সেটাও চাই না। আমরা চাই দেশে একটা কর্মসূচিভিত্তিক ঐক্য গড়ে উঠুক। জনগণের ঐক্য গড়ে উঠুক। আমরা ১৪ কোটি মানুষই চাই সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা, কালো টাকামুক্ত নির্বাচন এবং রাজনীতি । কার্যকর, সৎ এবং যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে সংসদ। যেখানে জনগণের মৌলিক সমস্যা নিয়ে অর্থপূর্ণ আলোচনা হবে, বিতর্ক হবে তথ্যভিত্তিক। কমিটিগুলো গভীরে গিয়ে তদন্ত করবে, বিবেচনা করবে। যেখানে সংলাপ করার সেখানে সংলাপ করবে। সকল বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ লোকদের মতামত নিয়ে নীতি নির্ধারণ আইন প্রণয়ন হবে। এই ধরনের সংসদ অবশ্যই আমাদের পাওয়ার কথা। এর অপেক্ষায় আমরা আছি।

অনুলিখন: **শিল্পী মহলানবীশ**

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম
ফোন : ৯১১৩৭৭১, ০১৭১৩৮৭৩৫৪, ০১৭১৯০৭৪৭৪